Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XII, Issue-II, January 2024, Page No.163-169
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

নৈতিক সমাজ গঠনে বুদ্ধের পঞ্চশীল: একটি পর্যালোচনা

জয়ন্ত বায়েন

রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বিভাগ -১, দর্শন বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ ,বীরভূম,পশ্চিমবঙ্গ,ভারত

Abstract:

Buddha was primarily an ethical teacher and a social reformer. Buddha's five precepts are most important in our practical life. The five moral precepts of buddha are known as panchasila. The word 'sila' means habit, character, behavior etc. Panchasila is the basic assumption of moral activities for both households as well as for renunciates. Abstaining from killing, abstaining from stealing, abstaining from sexual misconduct, abstaining from falsehood and abstaining from taking intoxicants- these five precepts of buddhism make a person disciplined, which is one of the most important ingredients for the development of overall personality of a person. Sila is the main driving force of human life. We can solve almost all problems by practicing the sila. A peaceful and beautiful society can be built if every person follows sila. A society or state in which peace will always prevail. So every person should follow Panchasila. As a result, family life will be happy as well as the path of the liberation will be widened. In this article, I have tried to show how it is possible to establish a moral society by practicing Buddha's panchasila.

Keywords: Buddhism, Precept, Sila, Morality, Panchasila, Laymen, Society.

সূচনা: বেদ বিরোধী ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়ে মধ্যে অন্যতম হলো বৌদ্ধ দর্শন। স্বয়ং বুদ্ধদেব বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শনের প্রবক্তা। সাধারণভাবে দার্শনিক বলতে যা বোঝায় সেই অর্থে গৌতম বুদ্ধকে দার্শনিক হিসেবে গণ্য করা যায় না। তাঁর বাণীর মধ্যে দার্শনিক চিন্তা ভাবনা লক্ষ্য করা গেলেও ধর্ম ও নৈতিকতার প্রাধান্যই বেশি। ধর্ম ও নৈতিকতার যোগসূত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সন্ধান পাওয়া যায় এই বৌদ্ধ দর্শনে, যার অন্যতম অভিধাই হচ্ছে শীলভিত্তিক ধর্ম। বুদ্ধদেব পরাতাত্ত্বিক আলোচনায় আগ্রহ না দেখিয়ে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে সমস্যা সমাধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তিনি ছিলেন সত্য দ্রষ্টা সাধক, সংস্কারক এবং নীতিবিদ।

গৌতম বুদ্ধ বাস্তবমুখী দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে জগত ও জীবনকে দেখেছিলেন। তিনি লক্ষ্য করেছিলেন যে, মনুষ্য জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ। বুদ্ধদেব উপলব্ধি করেছিলেন যে, দুঃখ থেকে নিবৃত্তিই মনুষ্য জীবনের মূল সমস্যা। এই সমস্যা সমাধান কল্পের জন্য তিনি গৃহ ত্যাগ করে ধ্যানমগ্ন হন। ধ্যান বা সাধনার দ্বারা বুদ্ধদেব যে চারটি সত্য উপলব্ধি করেছিলেন তা 'চত্বারি আর্যসত্যানি' বা 'আর্য সত্য চতুষ্টয়' নামে পরিচিত। এই চারটি আর্যসত্য হলো- দুঃখ, দুঃখ সমুদয়, দুঃখ নিরোধ এবং দুঃখ-নিরোধ মার্গ। মানুষের ব্যবহারিক

জীবনের অনুভূত দুঃখই পরমার্থসৎ এবং এই দুঃখ থেকে মুক্তির জন্যই বুদ্ধদেব আর্য সত্য চতুষ্টয়ের উপদেশ দিয়েছেন। এই চারটি আর্যসত্যের মধ্যে প্রথম তিনটি বুদ্ধদেবের শিক্ষার তাত্ত্বিক দিকের নির্দেশক এবং চতুর্থটি হল তাঁর ব্যবহারিক শিক্ষার নির্দেশক।

ভগবান বুদ্ধ কথিত চতুর্থ আর্যসত্য –'দুঃখ নিরোধ মার্গ' অর্থে সেই পথ যা অনুসরণ করে দুঃখের বিনাশ সাধন করা যায়। বুদ্ধদেব দুঃখ নিরোধের বা নির্বাণ লাভের উপায় হিসেবে আটটি অঙ্গের উল্লেখ করেছেন। অষ্ট অঙ্গ গুলি হল যথা- সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক বাক, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি এবং সম্যক্ সমাধি। বুদ্ধ নির্দেশিত দুঃখ নিরোধ মার্গ অষ্ট অঙ্গ বিশিষ্ট হওয়ায় এই মার্গকে 'অষ্টাঙ্গিক মার্গ' বলা হয়। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গকে বৌদ্ধ দর্শনে মধ্যপন্থা বলা হয়েছে। কেননা এই মার্গ একদিকে অসংযত ভোগ বিলাস এবং অন্যদিকে শারীরিক কৃচ্ছতাসাধন -এই দুটি চরমপন্থার মধ্যবর্তী। এই মধ্যপন্থাই হচ্ছে সাধনার উৎকৃষ্ট ও সহজতম মার্গ। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ নীতিশাস্ত্রের পরিচয় পাওয়া যায় এই অষ্টাঙ্গিক মার্গের মধ্যে। এই মার্গ সন্ন্যাসী এবং সাধারন মানুষের সকলের জন্যই প্রশস্ত। বৌদ্ধ দর্শনে আধ্যাত্মিকতার পথ এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ তিনটি ভাগে বা পর্যায়ে বিভক্ত যথা- শীল, প্রজ্ঞা এবং সমাধি। অষ্টাঙ্গিক মার্গের তত্ত্বগুলি ভালোভাবে লক্ষ্য করলে অনুধাবন করা যায় যে, বৌদ্ধ নৈতিকতায় শীল, প্রজ্ঞা ও সমাধিকে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় হিসেবে স্বীকার করা হলেও শীলের গুরুত্ব সর্বাধিক। শীল হচ্ছে চারিত্রিক শুদ্ধতা, সমাধি হচ্ছে মনোসংযোগ এবং প্রজ্ঞা অর্থে তত্ত্ব জ্ঞান। এই শীল বা চারিত্রিক শুদ্ধতার মাধ্যমেই আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রগতির শুভ সূচনা হয়। সমাধি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে যাত্রা করে প্রজ্ঞা বা চরমতত্ত্বজ্ঞানে এই অগ্রগতির সমাপ্তি ঘটে। শীল, প্রজ্ঞা ও সমাধি -এই তিনটি পরস্পর পরস্পরের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত, এদের একটি অন্যটির সাহায্য ব্যতীত ক্রিয়াশীল হয় না। শীল বা চারিত্রিক শুদ্ধতা আধ্যাত্মিক অগ্রগতির সূচনা হিসাবে গৃহীত হওয়ার জন্য বৌদ্ধমতকে 'শীলভিত্তিক ধর্ম' নামে আখ্যায়িত করা হয়।

'শীল' শব্দটির অর্থ হলো চরিত্র, স্বভাব, নিয়ম নীতি, আদর্শ জীবন গঠনের মার্গ ইত্যাদি। বৌদ্ধ নীতি শাস্ত্রে 'শীল' শব্দটি 'সদাচার' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এই শীল বা সদাচার হইতেছে যাবতীয় কুশল ধর্মের এমনকি দুঃখ মুক্তিরূপ নির্বাণ লাভেরও আধার বা প্রতিষ্ঠা। শীলে স্থিত হইলেই যাবতীয় কুশল প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবী যেমন সমস্ত জড় ও চেতন বস্তুর আশ্রয়, শীলও তদ্রূপ যাবতীয় কুশলের আশ্রয় বা আধার[1]। ভগবান বুদ্ধ সাধারন মানুষ ও তার শিষ্যদের শান্তিপূর্ণ নৈতিক জীবন যাপনের জন্য বেশ কিছু বিধি পালন করার উপদেশ দেন যা 'শীল' নামে পরিচিত। বৌদ্ধ দর্শনে আধ্যাত্মিক বিকাশের পরিপ্রেক্ষিতে যখন 'শীল'শব্দটি ব্যবহৃত হয়, তখন তার অর্থ বিশেষ ধরনের চরিত্র অর্থাৎ সৎ চরিত্র, যাকে নৈতিক চরিত্র বলা যায়। নৈতিক চরিত্র বলতে বোঝায় সেই সকল চারিত্রিক অভ্যাস যা নৈতিক নিয়ম অনুসারে পরিচালিত ও নৈতিক গুণের দ্বারা ভূষিত। কিন্তু শীল বলতে শুধু বাহ্য আচরণ বা ক্রিয়াকলাপকে বোঝায় না। এর একটা মনস্তাত্ত্বিক তাৎপর্য আছে। মনস্তাত্ত্বিক অর্থে 'শীল' বলতে বোঝায় চরিত্রের আভ্যন্তরীণ শুচিতা, মানসিক শুদ্ধতা। সুতরাং আমরা শীলের দুটি দিক দেখতে পায় -একটি বাহ্যিক দিক, যার উদ্দেশ্য হল চরিত্রের শুদ্ধতা এবং অপরটি হল আন্তর দিক, যার উদ্দেশ্য স্বভাবের শুদ্ধতা। এই দুটি একই সমগ্র দুটি দিক ও তারা পরস্পর সংযুক্ত। তারা পরস্পর পরস্পরকে শুদ্ধ করে অথবা নিজে নিজে শক্তি অনুসারে একটি অপরদিকে প্রভাবিত করে, যেমন- মানুষের মানসিক শুচিতা ও নৈতিকতা তার বাক্যে ও কর্মে প্রকাশিত হয়। সেরূপ কোন ব্যক্তি যদি অসৎকর্ম হতে বিরত থাকে তাহলে তার মানসিক প্রবৃত্তি ও প্রবণতাও পরিবর্তিত হয়।

সুতরাং শারীরিক বা বাচনিক ক্রিয়া, বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দুটি বিচ্ছিন্ন, স্বতন্ত্র স্বরুপের অনুষঙ্গ নয়, তারা চিত্তের অবস্থার মূর্ত প্রতিফলন এবং এই চিত্তের অবস্থাগুলি সমস্ত প্রিয়ার মূল উৎস।

বৌদ্ধ দর্শনে বহু সংখ্যক শীলের উল্লেখ থাকলেও শ্রমণ বা ভিক্ষুর জন্য যে সকল শীল পালনের উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা গৃহস্থ বা সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলি আবশ্যক নয়। বুদ্ধদেব গৃহীদের প্রতিদিন পাঁচটি শীল ও প্রতি অমাবস্যা, পূর্ণিমা ও অষ্টমী তিথিতে অষ্টশীল পালনের নির্দেশ দিয়েছেন এবং শ্রমণদের দশটি শীল পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন। এগুলি হলো- ১) প্রাণাতিবাদ-বিরতি, ২) অদত্তাদান-বিরতি, ৩) অব্রহ্মচর্য-বিরতি, (কাম সমূহে মিতাচার বিরতি), ৪) মৃষাবাদ-বিরতি, ৫) সুরামৌরেয মদ্যমাদকার্থ-বিরতি, ৬) বিকালভোজন-বিরতি, ৭) নৃত্যগীতবাদিত্ব-বিরতি, ৮) মাল্য গন্ধ বিলেপন -বিরতি, ৯) উচ্চাসন শয়ন- বিরতি এবং ১০) জাতরূপরজত পরিগ্রহ- বিরতি[2]। অর্থাৎ ১) প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি, ২) অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরতি, ৩) অবৈধ যৌনাচার থেকে বিরতি, ৪) মিথ্যা বাক্য থেকে বিরতি, ৫) সুরা, মদ, নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরতি, ৬) বিকাল ভোজন গ্রহণ থেকে বিরতি,৭) নৃত্য গীত বাদ্য শ্রবণ ও প্রত্যক্ষ করা ইত্যাদি থেকে বিরতি, ৮) মালা গন্ধ বিলেপন ধারণ মন্ডন ও বিভূষিত হওয়া থেকে বিরতি, ৯) আরামদায়ক উচ্চাসনে শয়ন থেকে বিরতি এবং ১০) স্বর্ণ, রৌপ্য ইত্যাদি গ্রহণ থেকে বিরতি।

উপরোক্ত দশশীলের মধ্যে প্রথম পাঁচটি শীল গৃহস্থগণ পালন করে। বুদ্ধদেব গৃহস্থদের জন্য নিত্য প্রতিপাল্য এই পাঁচটি নিয়ম বা নীতির উপদেশ দিয়েছেন যা, 'পঞ্চশীল' বা 'পঞ্চশিক্ষাপদ' নামে পরিচিত। কিন্তু যারা অধিক শ্রদ্ধালু তারা উপসোথ দিনগুলিতে প্রথম অষ্টশীল পালন করে তবে তারা দশশীলও পালন করতে পারে। পঞ্চশীল গৃহস্থদের পালনীয় কর্তব্য বলে এগুলিকে 'গৃহস্থশীল' ও বলা হয়। পঞ্চশীল হল পাঁচটি সদাচার পদ্ধতি, নৈতিক বিধান বা শৃঙ্খলা, যা পালন করলে আদর্শ ও নৈতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব। এগুলি মানুষকে নৈতিকভাবে আচরণ করতে সাহায্য করে। বৌদ্ধ নীতশাস্ত্রে পঞ্চশীল মূলত বুদ্ধের সাধারণ শীষ্যদের জন্য নৈতিক নীতি। উচ্চতর প্রশিক্ষণের বিকাশের আগে একজন ব্যক্তিকে এই নিয়মগুলি পালন করতে হয়। কারণ এগুলি একজন ব্যক্তির সামাজিক ও নৈতিক জীবনে একটা নৈতিক চরিত্র গঠনের মূল ভিত্তি। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি তার জীবনে বুদ্ধ নির্দেশিত পাঁচটি উপদেশ পালন করে তবে সে তার জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তুলতে পারে। বুদ্ধ কথিত পাঁচটি উপদেশ বা পঞ্চশীল নিম্নে আলোচিত হলো।

প্রথম উপদেশ- প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা: গৌতম বুদ্ধ তাঁর প্রথম অনুশাসনের মাধ্যমে সকলকে এই বার্তা প্রদান করেছেন যে, গৃহীকে বা সকল মানুষকে সর্বপ্রকার প্রাণী হত্যা থেকে দূরে থাকতে হবে। বুদ্ধদেবের মতে, একজন ব্যক্তি নিজে জীব হত্যা করবে না, অপর ব্যক্তিকে হত্যা করার আদেশও দেবে না, অপর দ্বারা হননের অনুমোদন করা যাবে না, সকল প্রাণীর প্রতি হিংসা ভাব পরিত্যাগ করতে হবে। কোনভাবে কোন জীব ধ্বংস করা যাবে না। কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে মানুষ পর্যন্ত সকল জীবের বাঁচার অধিকার আছে। প্রকৃতি আমাদের সমস্ত প্রাণীকে বাঁচার সমান অধিকার প্রদান করেছেন। এই পৃথিবীতে একটা মানুষের জীবনের মূল্য যতটা গুরুত্বপূর্ণ সেরুপ পিঁপড়ের জীবনের মূল্য ঠিক ততটাই তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকা সকলের কর্তব্য। পাঁচটি শর্ত বিদ্যমান, যা হত্যার অনৈতিক কাজ গঠন করে[3]-

১) একটি জীবন্ত প্রাণী, মানুষ, পশুর বাস্তবতা এবং উপস্থিতি, ২) জীব একটা জীবন্ত সত্তা বা জীব-এটা জ্ঞান রাখা, ৩) হত্যার অভিপ্রায় বা স্থির প্রতিজ্ঞা, ৪) উপযুক্ত উপায়ে হত্যার কাজ এবং ৫) ফলে মৃত্যুবরণ। হত্যা করার ছটি মার্গ আছে[4] - ১) নিজ হস্তে হত্যা করা, ২) আদেশ দিয়ে অন্যকে হত্যা করা, ৩) গুলি করে, পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা, ৪) পরিখা খনন করে, ফাঁদে ফেলে হত্যা করা, ৫) অতি প্রাকৃত বা যাদু বিদ্যার শক্তির দ্বারা হত্যা করা এবং ৬) মন্ত্র, অতিপ্রাকৃত বিজ্ঞান দ্বারা হত্যা করা।

প্রাণাতিপাত-বিরতি বা প্রাণী হত্যা থেকে বিরতি থাকার অপর নাম 'অহিংসা'। অহিংসক হওয়া একজন ভিক্ষুর যেমন কর্তব্য তেমনি গৃহস্থ এরও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। বৌদ্ধ দর্শনে 'হিংসা' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কেবলমাত্র জীব হত্যা হিংসা নয়, জীবের অমঙ্গল চিন্তা করাও হিংসা রূপে গণ্য হয়। বুদ্ধদেবের মতে, যে ব্যক্তি কায়- মন -বাক্যে হিংসা করে না অর্থাৎ যে ব্যক্তি শরীর বা দন্ড প্রয়োগ করে না অর্থাৎ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে না বা অনিষ্ট চিন্তা করে না সেই ব্যক্তিই প্রকৃতপক্ষে অহিংসক। বুদ্ধদেব নিজের জীবনে যেমন অহিংসার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সব জীবের প্রতি প্রেম, করুণা প্রদর্শন করেছিলেন সেরূপ সকল মানুষকে অহিংসক হওয়ার উপদেশও দিয়েছেন।

দ্বিতীয় উপদেশ-অদত্তবস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকা: এটি বুদ্ধ নির্দেশিত পঞ্চশীল এর মধ্যে দ্বিতীয় শীল। বৌদ্ধমতে, যা দেওয়া হয়নি তা গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে। একজন গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীর জীবনযাপনের জন্য যতটুকু প্রয়োজনীয় বস্তু দরকার ততটুকুই গ্রহণ করা উচিত। অতিরিক্ত প্রয়োজনীয় বস্তু গ্রহণ করা বা না বলে কিছু গ্রহণ করা উচিত নয়। না বলে পরের দ্রব্য গ্রহণ করলে তা চৌর্যবৃত্তিতে পরিণত হয়। শুধুমাত্র পর দ্রব্য গ্রহণ করাই যে চৌর্যবৃত্তি তা নয় যে কোনভাবে অন্যকে প্রতারণা করে তার বস্তুর অধিকারী হওয়াটাও চৌর্যবৃত্তির সমতুল্য। একজন গৃহস্থ বা সন্ন্যাসীকে যখন কোন বস্তু গ্রহণের প্রস্তাব দেওয়া হয় তখন কেবল তা গ্রহণ করা উচিত। চৌর্যবৃত্তি মানুষের চরিত্রকে কলঙ্কিত করে। পাঁচটি কারণ যা চৌর্যবৃত্তির অনৈতিক কার্য গঠন করে[5]-

১) অন্যের দ্রব্য বা সম্প্রতি গ্রহন,
২) সচেতন থাকা যে, এটি অন্যের সম্পত্তি যা নেওয়া হচ্ছে,
৩) চৌর্যবৃত্তির অনৈতিক ইচ্ছা,
৪) চুরি করার জন্য আদেশ দেওয়া এবং
৫) সম্পত্তি অপসারণের কাজ।

বৌদ্ধ দর্শনে চৌর্যবৃত্তির দুটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে - ১) সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে এবং, ২) পরোক্ষভাবে। কোন ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে কোন কিছু গ্রহণ করা হচ্ছে চৌর্যবৃত্তির প্রত্যক্ষ পদ্ধতি এবং প্রতারণার মাধ্যমে কোন ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করা হচ্ছে চৌর্যবৃত্তির পরোক্ষ পদ্ধতি। বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ অনুসারে ছয়টি উপায়ে চুরি সম্ভব যথা[6]- ১) নিজ হস্তে চুরি করা, ২) মিথ্যা পরিমাপ ও ওজনের মাধ্যমে চুরি করা, ৩)বল প্রয়োগ করে চুরি করা, ৪) গোপনে চুরি করা, ৫) নকশার দ্বারা চুরি করা, ৬) জালিয়াতীর মাধ্যমে চৌর্যবৃত্তি করা। এই ছয়টি উপায় অবলম্বন করার অর্থ হচ্ছে অন্যায় ভাবে অপরের সম্পদ গ্রহণ করা।

তৃতীয় উপদেশ- অবৈধ কামাচার হতে বিরত থাকা: মনুষ্য জীবনের বিভিন্ন চাহিদার মধ্যে অন্যতম হলো যৌনচাহিদা। যৌনচাহিদা বা আকাঙ্ক্ষা হল প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে তীব্র আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এই

আকাঙ্ক্ষা অন্যান্য প্রাণীর থেকে বেশি তীব্র কেননা, অন্য প্রাণীর মধ্যে এই আকাঙ্ক্ষা পর্যায় ক্রমিক ও ঋতুভিত্তিক কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এটি ক্রমাগত। অবৈধ কামাচার যেমন মানুষকে পশুতে পরিণত করে তেমনি আবার সংযত কাম মানুষকে দেবত্বে পরিণত করে।

গৌতম বুদ্ধ অবৈধ কামাচার হতে সকলকে বিরতি থাকার উপদেশ দিয়েছেন। বৌদ্ধ মতে, কামকে হতে হবে সংযত। সংযত কামই মানুষকে চরিত্রবান করে। বিদ্যা ও চরিত্র দুটোই মানুষের অমূল্য সম্পদ কিন্তু চরিত্রহীন ব্যক্তি বিদ্যান হলেও তার কোন মূল্য নেই। চরিত্রবাণ ব্যক্তিই প্রশংসার পাত্র। প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত নিজেকে চরিত্রবান করে তোল, চরিত্রহীন নয়। একজন গৃহস্থকে নিজ স্ত্রীকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। অনৈতিক ভাবে কামাচারে লিপ্ত হওয়া যাবে না। অবৈধ বা অনৈতিক কামাচার কেবল ব্যক্তির চরিত্রকেই কলঙ্কিত করে না, সমাজ ও রাষ্ট্রকেও নিম্নগামী করে। যা নৈতিক সমাজ বা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কখনোই কাম্য নয়। কামকে হতে হবে সংযত, বৈধ, যা যথার্থ নৈতিক সমাজ গঠনের অন্যতম হাতিয়ার।

চতুর্থ উপদেশ-মিথ্যা বাক্য বলা থেকে বিরত থাকা: বুদ্ধের এই উপদেশকে পালি ভাষায় 'মৃষাবাদ বিরতি' বলা হয়। বুদ্ধ মতে, আমাদেরকে মিথ্যা কথা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে, মিথ্যা ভাষণ বা মিথ্যা কথা বলা যাবে না। সভাগৃহে কিংবা পরিষদ গৃহে কেহ কাহারও সহিত মিথ্যা ভাষণ করিবেন না, কেহ কাহাকেও মিথ্যা ভাষণে প্রবৃত্ত করবেন না, মিথ্যা অনুমোদন করিবেন না সর্বপ্রকার মিথ্যা বর্জনীয় হইবে[7]। সকলের সত্য বাক্য বলাই উচিত। শুধুমাত্র যা সত্য তা বলা নয় বরং যে সত্য ভালো ও আনন্দদায়ক তা বলা। মিথ্যা কথা বর্জনীয়, কেননা মিথ্যা কথা ব্যক্তির ব্যক্তিত্বকে নষ্ট করে। মিথ্যাবাদী সকলের কাছে অসম্মানিত হন, যা ব্যক্তির নৈতিকতাকে নষ্ট করে, যা নৈতিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত নয়। নৈতিক সমাজ গঠন করতে হলে আমাদের সকলকে মিথ্যা কথা বর্জন করে সত্যের আশ্রয় নিতে হবে। তবেই তা সম্ভব। মিথ্যা কথা বললে অন্যের ক্ষতি সাধন হয়। যখন কোন ব্যক্তি মিথ্যা কথা বলে অন্যকে প্রতারিত করে সেই সঙ্গে নিজেও প্রতারিত হয়। অসময়ে সত্য কথা বললে অন্যের ক্ষতিসাধন হতে পারে, তাই বলা হয় যে, বুদ্ধকে কেবল উপযুক্ত সময়েই কথা বলেছেন, যা সত্য ও আধ্যাত্মিকভাবে উপকারী, তা অন্যের নিকট অসম্মত হোক না কেন।

'মৃষাবাদ হইতে বিরতি' ইহা শীলের নর্থক দিক। সদর্থক দিক হইতেছে সত্য কথা বলা, প্রিয় বাক্য বলা, মধুর বাক্য বলা, অন্যের কল্যাণ হয় এই রূপ বাক্য বলা, পরো উপকার চিত্তে কথা বলা, হিতকর এবং মনোহারি বাক্য বলা[8]।

পঞ্চম উপদেশ-সুরা-মদ-নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকা: গৌতম বুদ্ধের এই পঞ্চম শীলকে পালি ভাষায় 'সুরামৌরেয় মদ্যমাদকার্থ বিরতি' বলা হয়। বুদ্ধদেব আমাদেরকে পঞ্চম উপদেশের মাধ্যমে সুরা, মদ প্রভৃতি নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করা থেকে বিরতি থাকার উপদেশ দিয়েছেন। নেশা জাতীয় দ্রব্য ব্যক্তি তথা সমাজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত ক্ষতিকারক। সুরা, মদ ইত্যাদি নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করা ত্যাগ না করলে মানব সমাজের উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন করলে ব্যক্তির চিত্ত নিম্নগামী হয়, যা তাকে পতনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। শুধু যে নিজেকে ধ্বংস করে তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজেও ধ্বংসের দিকে অগ্রসর হয়। নেশা দ্রব্য সেবন করার ফলে একজন ব্যক্তির মনে রাখার, চিন্তা করার, নৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার, সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এমনকি এটি মানুষের সমস্ত ভালো গুণাবলী ধ্বংস করে। তাই চিত্ত শুদ্ধির জন্য একজন গৃহী বা সন্ন্যাসীর যথোচিত কর্তব্য হল মাদক দ্রব্য সেবন না করা।

বুদ্ধদেব বলেছেন, যদি কেউ পঞ্চম উপদেশ অমান্য করে তবে এটি ছয়টি বিপদের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, যথা[9]-

১) বর্তমানে অর্থের অপচয়,
২) ঝগড়া বৃদ্ধি করে,
৩) অসুস্থতার দায়,
৪) ভালো নামের ক্ষতিসাধন,
৫) একজন ব্যক্তির অশ্লীলতাকে প্রকাশ করে এবং
৬) জ্ঞানকে দুর্বল করে।

সুতরাং, আমাদের প্রত্যেকের উচিত নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবন না করা। এটিকে বর্জন করতে পারলে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ বহু সমস্যার হাত থেকে রক্ষা পেতে পারে এবং সুস্থ, স্বাভাবিক, সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বুদ্ধের পঞ্চম উপদেশটি লঙ্ঘিত হলে অপর চারটিকেও সঠিকভাবে অনুসরণ করা যায় না, তাই পঞ্চম শীলটি পালন করার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বুদ্ধ কথিত উপরোক্ত পাঁচটি উপদেশ যেন মানব জীবনের অমূল্য সম্পদ স্বরূপ, মানবজীবনের মূল চালিকা শক্তি, যা নৈতিক সমাজ গঠনে বলিষ্ঠ অবদান রাখতে পারে। বুদ্ধের প্রাণীহত্যা থেকে বিরত থাকার নীতি আমাদেরকে সর্বজনীন ভালোবাসা, দয়া, অন্যের জীবনের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শেখায়। চৌর্যবৃত্তি থেকে বিরত থাকার নীতি অন্যের সম্পত্তির প্রতি সম্মান, উদারতা, ত্যাগ ও অলোভের দিকে আমাদের উৎসাহিত করে। অবৈধ কামাচার থেকে বিরত থাকার নীতি অন্যান্য নারীদের প্রতি সম্মান করতে ও নিজের স্ত্রীর প্রতি সন্তুষ্টি থাকতে শেখায়। আবার মিথ্যা বাক্য থেকে বিরত থাকার নীতি সততা, আস্থা ও নির্ভরতার প্রতি সম্মানের দিকে নিয়ে যায়। তেমনি আবার নেশা জাতীয় দ্রব্য গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকার নীতি আমাদেরকে নিজের প্রতি সম্মান, মনের প্রতি শ্রদ্ধা ও অর্থের প্রতি শ্রদ্ধা করতে শেখায়।

বুদ্ধের এই পঞ্চশীল একজন ব্যক্তিকে যথার্থ নৈতিক গুণসম্পন্ন মানুষ হিসাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে, অর্থাৎ শীলহচ্ছে চরিত্র গঠনের নিয়ামক স্বরূপ, যা পালনের ফলে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠিত হয, যে সকল গুণ মানুষকে সঠিক অর্থে মহৎ করে তোলে নৈতিকতা তাদের মধ্যে অন্যতন। নৈতিকতা মানব জীবনের অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। সুষ্ঠু সামাজিক পরিস্থিতি, সুসংগঠিত জীবন, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ ও সমৃদ্ধ জীবনের জন্য নৈতিক শিক্ষার পরিচর্যা অনুশীলন ও প্রয়োগের কোনো বিকল্প নেই,বরং শান্তিপূর্ণ জীবন নিশ্চিত করতে প্রথম ও সর্বশেষ অপরিহার্য শর্ত হলো নৈতিক শিক্ষা। নৈতিক শিক্ষা মানুষের চেতনাকে জাগ্রত ও বোধকে শাণিত করে জ্ঞানকে করে স্বচ্ছ ও সমৃদ্ধ। সত্য ও সুন্দরের পূজারী হতে নৈতিক শিক্ষা অর্থাৎ শীল আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। চৌর্যবৃত্তি, মিথ্যাবাক্য, প্রাণী হত্যা, অবৈধ কামাচার পরিহার করা, সত্য ও ন্যায়ের আদর্শে নিজেকে পরিচালিত করা, অন্যের ক্ষতি সাধন না করা, গচ্ছিত সম্পদ ফেরত দেওয়া, সকল প্রাণীর প্রতি দয়াশীলতা ইত্যাদির মাধ্যমেই মানুষের জীবনের নৈতিক মূল্যবোধের উজ্জ্বল প্রকাশ ঘটে। এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তি মর্যাদা, সম্মান নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না, ব্যক্তিকে নৈতিক জীবন যাপনের মাধ্যমে সম্মান, মর্যাদার অধিকারী হতে হয়। এই সবই সম্ভব হতে পারে শীল পালনের মাধ্যমে।

পরিশেষে বলতে পারি যে, বিশ্বের বেশিরভাগ সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে শীলের মধ্যে। যদি প্রত্যেক ব্যক্তি বুদ্ধ কথিত পাঁচটি উপদেশ অনুসরণ করে তবে ব্যক্তি নিজেকে নীতিবান এবং তার জীবনকে

সফল ও সার্থক করে তুলতে পারে। ব্যক্তি সার্থক, সফল ও নীতিবান হলে সমাজ ও দেশে নৈতিকতা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। এইভাবে পঞ্চশীল পালনের মাধ্যমে নৈতিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। যে সমাজে সর্বদা শান্তি-শৃঙ্খলা, পারস্পরিকসম্প্রীতি, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়ণতা বজায় থাকবে। সুতরাং নৈতিক সমাজ গঠনের ক্ষেত্রে বুদ্ধের পঞ্চশীলের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম ও অপরিহার্য।

তথ্যসূত্র:

1) গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ডঃ সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) পৃষ্ঠা- ৬৪।
2) বিনয় পিটক,মহাবগগো, ১/৩/১২।
3) Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, Page-78.
4) Ibid, page-75.
5) Ibid, page-87.
6) Perspective on Buddhist Ethics, M.Tiwari, page-83.
7) বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন, স্বামী বিদ্যারণ্য, পৃষ্ঠা-৬৭।
8) গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, ডঃ সুকোমল চৌধুরী (সম্পাদনা) পৃষ্ঠা- ৬৭।
9) An Introduction to Buddhist Ethics, Peter Harvey, page-77।

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী:

1) বিদ্যারণ্য, স্বামী, বৌদ্ধ দর্শন ও ধর্ম, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ১৯৯৯।
2) চৌধুরী, সুকোমল, গৌতম বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলকাতা, মহাবোধি বুক এজেন্সী, ২০২১।
3) মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮।
4) Harvey, peter, An Introduction to Buddhist Ethics, Cambridge University press, 2000.
5) Saddhatissa, H.,Buddhist Ethics, Wisdom publication, London, 1987.
6) গুপ্ত, দীক্ষিত, নীতিশাস্ত্র, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যে পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৭।
7) Tiwari, M., Perspective on Buddhist Ethics, Department of Buddhist philosophy, 1989.
8) ঘোষ, পীযূষকান্তি, ও সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু, নীতিবিদ্যা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৪।
9) সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ২০০১।